যুদ্ধদিনের গল্প বলি

মখদুম আজম মাশরাফী

নয় মাস যুদ্ধ করেছি। গেরিলা আর সম্মুখ যুদ্ধ দুটোই। প্রতিদিনের যুদ্ধের অনেক মিল আছে আবার অমিলও আছে। আজ এমনি এক রাতের যুদ্ধের গল্প বলি।

জায়গাটির নাম বাউরা। বৃহত্তর রংপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা। এখানে পাটগ্রাম, বড়খাতা, বাউরা, লালমনিরহাট পরপর সারিতে নাম।পাটগ্রাম, বড়খাতা তখন মুক্ত এলাকা। বাংলাদেশের মানচিত্রের সবচেয়ে ওপরের দ্বিতীয় আঙ্গুলের মত অঞ্চলটিই হল এই এলাকা। বাউরা আর লালমনিরহাটের মাঝখানে ছিল আমাদের ডিফেন্স লাইন। এই ডিফেন্স লাইনের এক অংশ ছিল এম,এফ বা মুক্তিফৌজের আর অন্য অংশটি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর (বি, এস,এফ নয়)। এখানে আমি এবং আমরা ক'জন ছিলাম এফ, এফ বা ফ্রিডম ফাইটার। বাংলাদেশ বাহিনীর এই দুই ক্যাটাগরী মিলেই ছিল এই সম্মুখ যুদ্ধের ডিফেন্স লাইন। মুক্তিফৌজ বলা হত তাদের যারা বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ই,পি,আর (ঈষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস) এর নিয়মিত সৈনিক। আর এফ, এফ বলা হত আমরা যারা ছাত্র, তরুন সিভিল জীবন যাত্রা থেকে সংক্ষিপ্ত সামরিক আর গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিলাম।

আমাদের আর ভারতীয় বাহিনীর ডিফেন্স লাইনের মুখোমুখি ছিল প্রতিপক্ষ পাকিস্তানী নিয়মিত সেনাবাহিনীর মজবুত ডিফেন্স লাইন। প্রায় মাত্র ১৫০-২০০ গজ দুরত্বে । দিনের আলোয় আমরা পরস্পরকে দুর থেকে খালি চোখেই ছায়ার মত চলাফেরা করতে দেখতে পেতাম। এই ডিফেন্স ছিল সম্পূর্ণ গেড়ে বসা প্রস্তুত অবস্থা। আরেকটু পরিষ্কার করে বলি।্কাঠামোটি ছিল এ রকম। এক গ্রুপ সৈনিকের জন্য ছিল একেকটি ডিফেন্স পোষ্ট। প্রতিটি পোষ্টে ছিল প্রতি কোনে ৪ টি থেকে ৬ টি মজবুত বাংকার । এই বাংকারগুলি আবার মাটির মোটা পাঁচ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে একটির সঙ্গে অন্যটি যুক্ত ছিল। মাঝখানে ছিল খোলা জায়গা এক বাংকার থেকে অন্য বাংকারে মাটির দেয়ালের নিরাপত্তা মধ্যে চলাচলের জন্য। বাংকারের ছাদ আর কাঠামো রেললাইনের কাঠের স্লিপার দিয়ে গড়া। সে স্লিপারগুলির ওপর পলিথিন জাতীয় আস্তর দিয়ে তার ওপর মাটির প্রায় দেড় ফুট পুরু স্তর দিয়ে ছাদ ঢাকা। এভাবে প্রায় ৫০-৬০ গজ দুরে দুরে অন্য আরও অনেক সারি সারি এ ধরনের পোষ্ট। বাংকারে যে স্লিপার গুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা এসেছিল পাশেই বেঙ্গল-ডুয়ার্স ব্রডগেজ লাইনের উপড়ে ফেলা রেল লাইন থেকে। তখন পাটগ্রাম থেকে বাউরা অবধি রেল সড়কটি রেল লাইন তুলে ফেলে রেলের পরিবর্তে সামরিক লরি, গাড়ীর সরবরাহ পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংকার গুলির সম্মুখভাগে আড়াআড়ি ভাবে সরু ও লম্বা জানালার মত অর্গল, যেগুলির ভেতর দিয়ে সম্মুখভাগে দৃষ্টি রাখা আর বন্দুকের নল ঢোকানোর ব্যবস্থা ছিল। পাশের বাংকারগুলি পার্শ্ববর্তী এলাকায় নজর রাখার জন্য। আর পেছনের সারির বাংকারগুলি পেছনে লক্ষ্য রাখার জন্য। অনেকটা ছোট দূর্গের মত।

আমাদের ডিফেন্স বরাবর পাকিস্তানী প্রতিপক্ষ বাহিনীর ছিল প্রায় একই রকম বাংকার ব্যবস্থা। মুখোমুখি সারি সারি। এগুলো এমন পাকা-পোক্ত করে গড়া যে এমন কি মোটামুটি ভারী অস্ত্র যেমন এল,এম, জি (লাইট মেশিন গান), বি, এম, জি (বিগ মেশিন গান), টু ইঞ্চ মর্টার, থ্রি ইঞ্চ মর্টার রাইফেল গ্রেনেড, এগুলোর ভেতরে থাকলে ক্ষতি করতে পারে না। আবার আর্টিলারী বা ভারী শেলিং হলে ক্ষতির সম্ভবনা থাকে। তবে সে অবস্থায় প্রথম আক্রমন ঠেকিয়ে প্রতি আক্রমন করা সম্ভব হয়। এপ্রিলে ট্রেনিং শেষে আমরা ৮০ জন এফ, এফ আর অন্য এলাকা থেকে ৭০ জন এম, এফ গেরিলাযুদ্ধের জন্য আমাদের তাবু শিবির স্থাপন করি ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর

মহকুমার কোটগছ সীমান্ত ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি স্কুল মাঠে। এখান থেকে প্রতি রাতে আমরা ছোট বড় দলে বাংলাদেশের শত্রু অধিকৃত এলাকায় প্রবেশ করে অনেক দুঃসাহসিক গেরিলা আক্রমন চালিয়েছিলাম। এই ক্যাম্পে আমাদের কমান্ডার ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর কম্যান্ডো মেজর বোম বাহাদুর শারকী। সে গল্প অন্য সময় বলা যাবে।

যা হোক সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের মধ্য থেকে ১২ জনের একটি দল সম্মুখ যুদ্ধে যোগ দিতে বাউরা ডিফেন্স এ আসি। আমরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতাম। ৬ জনের এক দলনেতাকে সিক্সার বলা হত। বিভিন্ন অপারেশনের এসাইনমেন্টে সিক্সার রোল রোটেশন হত। গেরিলা ইউনিট হিসেবে এই ডিফেন্স লাইনে আমাদের কাজটি ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। পরিকল্পনা মত বাংকারের বা পোষ্টের নিরাপত্তা বেষ্টনীর সামনে নিজ ও শত্রু ডিফেন্স লাইনের মাঝখানে আমরা ৬ জনের একটি দল রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে গিয়ে ধানক্ষেতের আলের পাশে বা বাঁশঝাড়ের কিনারে অবস্থান নিতাম।আমাদের দায়ীত্ব ছিল আক্রমনের জন্য শত্রু কম্যান্ডোদের যে কোন অগ্রযাত্রা আচঁ করা, তা অতি গোপনে আমাদের ডিফেন্সকে সতর্ক করা আর প্রাথমিক গেরিলা প্রতি-আক্রমন রচনা করা। অনেকটা অগ্রপ্রহরীর মত হলেও ছিল আত্মঘাতী দায়ীত্ব। এ কৌশল, কারন এই ডিফেন্স লাইন এতই দুর্ভেদ্য যে দুপক্ষের সম্মুখ গোলাগুলি কোন ফলাফল আনতে পারে না যতক্ষন না ডিফেন্স লাইনের পেছনে পৌছে অতর্কিত গোপন আক্রমন করা যায়। অথবা খুব বড় বড় ভারী অস্ত্র, আর্টিলারী ব্যবহার করতে করতে বাহিনী না অগ্রসর হয়। আমরাও মাঝে মাঝে আমাদের কম্যান্ডো দল গঠন করে পাকিস্তানী ডিফেন্সের পেছন থেকে আক্রমন চালাতাম। এ আক্রমন ছিল বেশ মজার ব্যপার। আমরা শত্রুর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্যে এ সব অপারেশনে কয়েক হাজার ডামি গুলি ফোটাতাম। একটি রশির মত বিস্ফোরক লম্বা তারে সে সব ডামি গুলি গেথে গেথে বানানো এই অভিনব হাতিয়ার। রশির মুখে আগুন দিলে এটি অটোমেটিক অস্ত্রের মত গুলির আওযাজ করতো। মনে হত অনেক রাইফেল একসাথে গুলি চালাচ্ছে। তারপর আমরা "জয় বাংলা" বলে শত্রুর বাংকারে চড়াও হয়ে গ্রেনেড হামলা চালাতাম। ওরা হকচকিয়ে বাংকার ছেড়ে দিকবিদিক পালাতো । পাকিস্তানী কম্যান্ডো দলও কয়েকবার সর্ন্তপনে আমাদের ডিফেন্স লাইনের পেছন থেকে ছোট ছোট অস্ত্র যেমন চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল, টু ইঞ্চ মর্টার, রাইফেল গ্রেনেড, হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে আক্রমন চালিয়ে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

এ দায়ীত্বে আমরা ৬ জনের দুজন করে জেগে পাহারায় থাকতাম। আর ৪ জন ঘুমাবার চেষ্টা করতাম। সারাদিনের ক্লান্তি থাকলে ঘুম আসতো তাড়াতাড়ি। নইলে বেশ বেগ পেতে হত। পারফরমেন্সের জন্য ঘুম জরুরী। নিজের এবং সবার নিরাপত্তার জন্যেও। পর্য্যায়ক্রমে দুঘন্টা পর পর প্রহরা ডিউটি পরিবর্ত্তন করতাম। আর তা করতে হতো অত্যন্ত সতর্ক নিঃশব্দে। কারন পাকিস্তানের ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতরে খুবই অরক্ষিত অবস্থায় আমাদের এ দায়ীত্ব পালন করতে হতো ।আমাদের পরনে থাকতো হাফ প্যান্ট আর দুপাশে পকেট ওয়ালা পুরোনো ডিজাইনের শার্ট। পায়ে জঙ্গল বুট (রাবারের সোল ক্যানভাসের সবুজ জুতা)। অস্ত্র হালকা। মার্ক ৪ অথবা থ্রি নট থ্রি রাইফেল । কখনও এস, এল, আর (সেমি অটোমেটিক রাইফেল)। দু একটি এস, এম, জি (স্মল মেশিন গান)। প্রতিজন দুটি করে হ্যান্ড গ্রেনেড আর কয়েক শ" রাউন্ডস (গুলি) বহনের জন্য মোটা কাপড়ের চওড়া বেল্ট। তেমনি এক রাতে আমরা এই কাজের দায়ীত্বে আছি। রাত ক্রমশঃ গ্ভীর হচ্ছে। শিয়ালের ডাক আর চলাচলের শব্দ, ঝি ঝি পোকার অনবরত আওয়াজ, নানান পোকামাকড়ের বিচিত্র নৈশ শব্দ রাতের পরিবেশ বেশ রহস্যঘন করে তুলছে। জোনাকি জ্বলছে-নিবছে। না কোন পাখ-পাখালীর নড়াচড়ার কোন শব্দ নেই। কারন প্রায়ই গোলাগুরি শব্দে পাখীরা আনেক আগেই এ এলাকা থেকে উধাও হয়েছে। কখনও কখনও কেবল শেয়ালেরা মাইনে পা দিয়ে মারা পড়তো । আর সে বিস্ফোরনের শব্দ সচকিত করতো সবাইকে। দুপক্ষের ডিফেন্স মধ্যবর্তী এ জায়গাটি আরও ভয়ংকর এ জন্যে যে সেখানে অনেক মাইন পাতা। এন্টি পার্সোনাল ১৪ ও ১৬। ১৪ শুধু একজনের একটি পা আহত করে। ১৬ তে পা পড়লে অথবা বুবি ট্রাপের লুকোনে তারে পায়ের টান পড়লে এই মাইনে প্রথম

বিস্ফোরনে বুকের সমান উঁচুতে লাফিয়ে উঠে দ্বিতীয় বিস্ফোরন ঘটায় যা পুরো দলকে আহত ও নিহত করতে পারে।এছাড়াও থাকতো 'পাঞ্জার' ঝাক পাতা। পাঞ্জা হল অতি সাধারন বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী দেড় ফুট লম্বা দুদিকে ছুচালো তীক্ষ্ণ প্রান্ত শূল বিশেষ। এ গুলো ধানক্ষেতের নরম মাটিতে তেরচা করে সারি সারি ধান চারার মতই গেড়ে দেয়া হত। যাতে করে ক্রলিং করে কোন শত্রু বাহিনী গুলি এড়িয়ে অগ্রসর হতে না পারে। এ গুলো সংখ্যায় অনেক। অন্ধকারে খুঁজে তুলে ফেলে ফেলে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বাহিনীর মাইন আর পাঞ্জার ব্যপারে আমরা জানি। কিন্ত শত্রুর পাতা যেগুলো সেগুলো অজানা ও বিপজ্জনক। তাই অন্ধকারে বেড়ালের নীরবতা নিয়ে এ দায়ীত্ব পালন করার বিশেষ দক্ষতা দরকার হতো ভাগ্যও দরকার হতো।

যা হোক। রাত যখন প্রায় মধ্যযামে, হঠাৎ শুরু হলো চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেলের গুলি ছোড়ার শব্দ। আমাদের খুব কাছাকাছি। এই বিশেষ রাইফেলটি ছিল শত্রুর। শব্দ থেকেই চিনে নেয়া যেত। আমরা হানা পাওয়া মৌমাছিদের চাকের মত বিহববল হয়ে উঠলাম। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রান্ত হলাম। গুলি শাঁ শাঁ করে কানের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে লাগলো। আমরা ট্রেনিং মত একটু দৌড়ে আবার আড়ালে শুয়ে পড়তে, আবার দৌড়ে এভাবে আমাদের ডিফেন্স লাইনের দিকে যেতে থাকলাম। আমরা প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম। একবার হঠাৎ দেখি কে যেনো আমাকে মাটিতে শোয়া থেকে তুলে গড়িয়ে দিল এক দিকে। আঁচ করে দেখি ভারতীয় বাহিনীর কম্যান্ডো, যার রেইর কোটের ওপর আমি শুয়ে পড়েছিলাম। সে উঠে দৌড় দেয়াতে আমি গড়িয়ে গিয়েছিলাম ।সে আমাকে ইঙ্গিতে ছুটতে বলে নিজের দিল দৌড়। শুরু হলো শত্রুর তুমুল গুলি। আমরা না ফেরা পর্য্যন্ত আমাদের ডিফেন্স গুলি চালাতে অপেক্ষা করলো কিছুক্ষন। শত্রুরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে অগ্রসর হতে থাকলো আমাদের ডিফেন্স লাইনের খুব কাছাকাছি। কে কোথায় জানার আগেইআমি গিয়ে পড়লাম এক বাঁশ ঝাড়ের পাশে কাটা ট্রেঞ্চের গর্তের মধ্যে। ইতোমধ্যে আমাদের ডিফেন্স থেকেও গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারে্ দুপক্ষের তুমুল গোলাগুলির ক্রসফায়ারে এই ট্রেঞ্চই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল সে বিপদে।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক চললো গোলাগুলি। সামনে পেছনে, ডানে বাঁয়ে চারিদিক থেকে আসছে গুলি, সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে, বাঁশ ঝাড়ে এসে লাগছে.. সে এক তুলকালাম অবস্থা।আমার পাশেই দেখি মাথা নামিয়ে ট্রেঞ্চে বসে আছে আমার দলের আরেকজন।এ অবস্থান থেকে গুলি ছোড়ার কোন লক্ষ্য নেই আবার নিরপত্তার নেই এই ভেবে যে নিজেদের কাউকে না গুলি করে বসি।ভোরের আলো ক্রমশঃ ফোটার সাথে ক্রমে কমে আসতে থাকলো শত্রুর গুলির শব্দ। ওরা পেছন হটতে হটতে চলে গেল। ভোরের বাতাসে ভেসে থাকলো শুধু বারুদ গন্ধ।

১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২, মেলবর্ন